রেখাচিত্র অভিজিৎ সেনগুপ্ত

রোমিলা থাপার

বিরুদ্ধতার স্বর

বেদের সময় থেকে শাহিনবাগ

প্রতিক্ষণ
ভালো বইয়ের ৪০ চার দশক
৫ সূর্য সেন স্ট্রিট । কলকাতা

স্বল্পকথা

২০১৯-এ অধ্যাপক রোমিলা থাপার দিল্লিতে দুটি স্মারক-বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বক্তৃতাটির প্রায় সমসময়ে মূলত শাহিনবাগকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে *সিএএ-এনআরসি*-বিরোধী প্রতিবাদ-প্রদর্শন একটি জাতীয় আন্দোলনের চেহারা পায়। সেই প্রতিবাদী আবহে উল্লিখিত বক্তব্যগুলি অতীব সময়ানুগ হয়ে ওঠে। ২০২০-র মার্চের পর শাহিনবাগ আন্দোলন বাধ্যতার কারণে স্তিমিত হয়ে আসে। ওই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা কিন্তু ক্ষয়িত হয় না। যে প্রেক্ষিতে কথাগুলি বলা জরুরি হয়েছিল, তা এই ২০২৩-এ, বইটির প্রথম বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করার সময়েও জায়মান রয়েছে। স্বাভাবিক, কারণ কোনও রাষ্ট্রসমর্থিত ভাষ্য যদি দেশে বা সমাজে একশিলীভূত স্বর হয়ে উঠতে চায়, বিরুদ্ধতার একটি স্বরও অবধারিতভাবে শ্রাব্য হয়ে ওঠে। রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন বিরুদ্ধ স্বরের উদ্ভাস ও তাকে রুদ্ধ করতে চাওয়ার অনুশীলন—দুটির কোনোটিই অর্বাচীন নয়।

আধুনিক ভারতে রাষ্ট্রবিরোধিতার পরিসর, রূপ ও মাত্রা প্রসঙ্গে লেখক বেশ জোরেসোরে গান্ধিবাদের পক্ষে সওয়াল করেছেন। রাষ্ট্র সহিংস উপায়ে নাগরিককে দমন ও পীড়ন করলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রূপ হিসেবে যে কোনও ধাঁচের সশস্ত্র প্রতিরোধ বা সংগ্রামকে তিনি সমর্থন করেননি; বরং স্পষ্টতই বলেছেন—"আমি অবশ্য অহিংস বিরুদ্ধস্বরগুলিকেই প্রতীকী অর্থে শ্রুতিগোচর করে তুলতে চাই"—কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে "রাষ্ট্র ও নাগরিকের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য এবং তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য উভয় পক্ষ ফলপ্রসূ সংলাপে রত হলে তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হতে পারে।"

ভূমিকা ৯
বিরুদ্ধতার স্বর: একটি আলোচনা ১১
পাঠ ১৪৫

ভূমিকা

২০১৯ সালে দিল্লিতে আমি দুটি স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলাম। এই প্রবন্ধের বীজ সেগুলির মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রথমটি ছিল *নেমিচাঁদ স্মারক বক্তৃতা*, বিষয় '*অপর*-এর উপস্থিতি: প্রাচীন ভারতে ধর্ম ও সমাজ', তারিখ ২০১৯-এর ১৬ আগস্ট। দ্বিতীয়টি ছিল *ভি এম তারকুন্ডে স্মারক বক্তৃতা*, বিষয় 'ত্যাগ, বিরুদ্ধতা ও সত্যাগ্রহ', বক্তৃতার তারিখ ২০১৯-এর ৬ ডিসেম্বর।

যেহেতু বিষয়ের মিল আছে, তাই এ দুটিকে জুড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এক বন্ধু। ফিরে পড়তে গিয়ে দেখলাম, দুটি বক্তৃতাকে আমি একটি বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের মধ্যে বুনে দিতে পারি। এক অর্থে দেখলে, প্রথম বক্তৃতাটি দ্বিতীয়টির জন্য একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির জোগান দেয়। তাই আমি দুটিকে একসঙ্গে এনে নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে বসালাম। প্রথম বক্তৃতাটি এ প্রবন্ধের প্রথম অংশের উপাদান, আর দ্বিতীয়টি পরবর্তী অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতীয় অতীতের বিশেষ বিশেষ সময়ে যে বিভিন্ন ধরনের বিরুদ্ধতার প্রকাশ ঘটেছে, এ কাজ করতে গিয়ে আমি তার বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে পৌঁছতে চেষ্টা করেছি। তবে আলোচ্য ধরনগুলি কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত।

দেবিকা জৈন এবং দীপক নায়ার একটি বক্তৃতা পড়ে সহায়ক মন্তব্যের জোগান দিয়েছেন। বড় প্রবন্ধটি আমি শিরিষ পটেল, কুণাল চক্রবর্তী এবং নবীন কিশোরের মতো অন্যান্য কয়েকজন বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়েছিলাম—এবং তাঁদের মন্তব্য থেকেও উপকৃত হয়েছি।

প্রাচীন ভারতে বিরুদ্ধতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমি আগেও লিখেছি, কিন্তু বর্তমান সময়ের পরিস্থিতি দেখে মনে হল বিষয়টি আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচারের দাবি রাখে। প্রবন্ধের শেষাংশটির উদ্দেশ্য শুধু অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন নয়, বরং একথাও সেখানে বোঝানোর চেষ্টা করা

হয়েছে যে বিরুদ্ধতার বিশেষ কয়েকটি ধরন অতীতের ধারাবাহিকতারই ফসল। আমি বিষয়টিকে একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। আর তা করতে গিয়ে আমি যুক্তি দিয়ে দেখাতে চেয়েছি যে, ইতিহাসবিদ হিসেবে বিরুদ্ধতার অবস্থানকে চিহ্নিত করাটাই যথেষ্ট নয়, কারণ তার পাশাপাশি এ ইঙ্গিতও দিতে হবে যে, কেন এবং কাদের কাছে অতীতে বিরুদ্ধতার ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তার অর্থ, সেই ধরনের বিরুদ্ধতাগুলিকে দেখা যেগুলি জনপরিসরে সাড়া পেয়েছিল। বিশেষ বিশেষ বিরুদ্ধতার প্রকাশের ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে মোটের উপর একইরকম ধারাবাহিকতা দেখা গিয়েছিল কি না, সে প্রশ্নই আমার মূল আলোচ্য বিষয়।

যেহেতু যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তাকে প্রশ্ন না করলে জ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব নয়, তাই বিভিন্ন সভ্যতা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা বোঝার জন্যও বিরুদ্ধতা নিয়ে চর্চা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এখানে যোগ করা দরকার যে এ প্রবন্ধ লেখা হয়েছে গত ছ' মাসে—চরম অনিশ্চয়তার সময়ে, কিন্তু অনিশ্চয়তাগুলি যাতে আমাকে অসহায় না করে ফেলে, সে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

রোমিলা থাপার
দিল্লি, সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রা ক্ ক থা

বিরুদ্ধতা কি জরুরি?

এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদের, কিংবা আরও সর্বজনীন অর্থে বললে মানুষের জীবনকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যে মতবিরোধ, তাকেই আমরা বিরুদ্ধতা বলব। সেই কোন অনাদিকাল থেকেই তো মানুষের মধ্যে মতান্তর ঘটে আসছে। তাঁরা তর্ক করেছেন, বা মতানৈক্যের পক্ষে মত দিয়েছেন, কিংবা শেষমেশ এসে পৌঁছেছেন কোনও একটি মতে। এই সমস্ত কিছুই জীবনের, যাপনের অংশ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রভাব আছে, সাধারণভাবে তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এ জাতীয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই বিভিন্নরকমভাবে বিবর্তিত হয়েছে। হালে আমরা বুঝতে শুরু করেছি যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তোলার বিষয়টি আমরা যতটা ভেবে থাকি ততটা সাম্প্রতিক নয়— বস্তুত সে চর্চা বহু শতাব্দী ধরেই চলে আসছে।

প্রশ্ন তোলা এবং তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা, বা নিছকই অন্যতর অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে মতানৈক্যের যে বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, বিরুদ্ধতা তার অংশবিশেষ। এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে বিরুদ্ধতার অন্যান্য আঙ্গিকগুলিকে আমি আদপেই খাটো করছি না, বরং সমনোযোগ দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করছি সেই আঙ্গিকগুলির প্রতি যাদের আমরা আমাদের অতীত এবং তার সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্রাত্য করেছি; সেই অতীত ও তার সংস্কৃতির উত্তরাধিকারই কিন্তু আমরা দাবি করি বর্তমান সময়ে, তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখও হয়ে থাকি। যেহেতু অতীতকে আমরা নির্মাণ করেই চলেছি, তাই যে ধারণাগুলি দিয়ে আমরা সেই নির্মাণকাজ করে থাকি, সেগুলিও একইভাবে নির্মিত হয়ে চলেছে। এই ধারণাগুলি নিয়ে অনুসন্ধান চালানোর জন্য পুরোনো এবং নতুন দুটি সূত্রই একান্ত প্রয়োজনীয়। বিরুদ্ধতা বিষয়ে সামগ্রিক অনুসন্ধান চালাতে হলে

আমাদের সেই সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে হবে যেখানে মতবিরোধ থেকে গড়ে উঠেছে সহিংস ও অহিংস প্রতিবাদ। তবে আমি অবশ্য অহিংস বিরুদ্ধস্বরগুলিকেই প্রতীকী অর্থে শ্রুতিগোচর করে তুলতে চাই।

বিরুদ্ধতার ধারণাটি আধুনিক নয়, কিন্তু তাকে এই বিভিন্ন আঙ্গিকের নিরিখে চিহ্নিত করার বিষয়টি নতুন ঘটনা। প্রকৃত উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক সমাজে যে এভাবে প্রশ্ন তোলাকে চোখ না রাঙিয়ে বরং উৎসাহ দেওয়া হয় এবং আলোচনার মাধ্যমে তলিয়ে দেখা হয়, সে ঘটনাও নতুন। প্রশ্ন করার অধিকার এখন সর্বজনীন, অবাধ এবং যে কোনও নাগরিকই সে অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম। অতীতে সে অধিকার শুধুমাত্র প্রভাবশালীদেরই করায়ত্ত ছিল, কিন্তু আজ অন্তত তত্ত্বগতভাবে তা প্রত্যেক নাগরিকের নাগালে এসেছে। অতীতে এই অধিকার নিয়ে অনেক বাগবিতণ্ডা হলেও তখন সর্বক্ষেত্রে তা সর্বসাধারণের সমস্যা হয়ে উঠত না, বর্তমানে কিন্তু সে ঘটনা ঘটে থাকে। এর ফলে বিরুদ্ধস্বরের গুরুত্বকে চেনার এবং বোঝার দায়িত্ব খানিকটা হলেও আমাদের উপর বর্তায়। এই সমস্ত অধিকারপ্রাপ্তির মধ্যে যা উহ্য তা হল, যেখানে সঠিক মনে হবে, সেখানেই বিরুদ্ধতা প্রয়োগ করতে হবে। আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটলেও গোটা প্রক্রিয়াটির মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। আমি সেই ধারাবাহিকতাকেই কিছু উদাহরণের মাধ্যমে তলিয়ে দেখতে চাই।

প্রত্যেক আধুনিক সমাজে সবসময় নাগরিকদের বিরুদ্ধতার অধিকার দ্ব্যর্থহীনভাবে বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারেরই অংশ হওয়া উচিত। এই অধিকার বিতর্কিত বটে, তবু বিভিন্ন সমাজের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এ বিষয়ে আমাদের ধারণা যা-ই হোক না কেন, অন্য যে কোনও সমাজের মতোই ভারতীয় সমাজেও নিটোল ঐক্য ও সম্প্রীতির সমাহার ঘটেনি। অসহিষ্ণুতা ও হিংসার ইতিহাস আমাদের সমাজেও ছিল, ছিল চিন্তার সংঘর্ষও। বহু বিরুদ্ধস্বরের অস্তিত্ব এ সমাজে ছিল। আমরা বিরুদ্ধস্বরকে যতটুকু স্বীকার করতে রাজি, অতীতে তার তুলনায় ঢের বেশি ব্যাপক ছিল তার উচ্চারণ।

এখনকার মতোই ঐতিহাসিকভাবেও সামাজিক সম্পর্কগুলি গ্রথিত হয়ে উঠেছিল দুটি ভিন্ন পক্ষের মধ্যে। যাদের হাতে ক্ষমতা এবং মালিকানা আছে—তা সে জমি, সম্পত্তি, রীতিনীতি বা অন্য যা কিছুই সে ক্ষমতার কারণ হোক না কেন—তাঁদের সঙ্গে মালিকানা ও ক্ষমতাহীনদের দ্বন্দ্বই ছিল সেই সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি। রাজা ও প্রজা, সামন্তপ্রভু ও দাস, কারখানার মালিক ও শ্রমিক, ঔপনিবেশিক শাসক ও শাসিতের মতো শব্দজোড়গুলির দিকে তাকালেই আমরা সেকথা বুঝতে পারি। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে জোরালো একটি ঐতিহাসিক

পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন এক সমাজের পথ তৈরি হয়। শিল্পায়ন, পুঁজিবাদ, নতুন প্রযুক্তির উপর মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণ, যে শ্রমিকরা শ্রমের জোগান দেন, যে কৃষিজীবীদের উপর কৃষি-উৎপাদন নির্ভরশীল—এঁদের সবার কথা সে সমাজে বলা হচ্ছিল। এই নতুন সমাজকে যে সূত্রগুলির মাধ্যমে একসঙ্গে গাঁথার কথা ভাবা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম হল জাতীয়তাবাদ বা মানুষের কোনও একটি বিশেষ জাতি-রাষ্ট্রে অংশীদারীত্বের বোধ। সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে, যে বিশাল পরিবর্তনটি এখানে উহ্য, সেটি হল সমাজের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্য ভিন্ন এক সম্পর্কের বিবর্তন। জাতির ক্রিয়াশীলতার জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল নাগরিক হিসেবে মানুষের সঙ্গে তাঁদের সমষ্টিগত সৃষ্টি রাষ্ট্রের সম্পর্ক। সুতরাং নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবার আলোচনার কেন্দ্রে চলে এল।

এই ঐতিহাসিক পর্যায়টি শাসনব্যবস্থার চেহারাতেও পরিবর্তন ঘটায়—গণতন্ত্রের উত্থান পূর্বতন রাজতন্ত্রকে প্রতিস্থাপিত করে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক অবস্থান সমান, তাই গণতান্ত্রিক সমাজগুলির পক্ষে শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ হওয়াই সম্ভব। গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমাজের সব স্তরের প্রতিনিধিরাই থাকেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের সমমর্যাদার অধিকার আছে। এই ব্যবস্থাটি ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিকতা ও জাতীয়তাকে সংহত করতে সাহায্য করে। সত্যিকারের গণতন্ত্রের মূলগত ধারণা হল বিরুদ্ধতার অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবি পূরণের প্রয়োজনীয়তা। যেহেতু সব নাগরিকই গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং আইনত সমান মর্যাদার অধিকারী, তাই গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ না হয়ে কোনও উপায় নেই।

এই জাতীয় মোটা দাগের ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলিকেই আধুনিক সময়ের সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে আমি এই আলোচনা শুরু করতে চাই বিরুদ্ধতার অপেক্ষাকৃত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করার মাধ্যমে, কারণ তার মধ্য দিয়েই বিরুদ্ধতাকে চেনা যেতে পারে। যাঁরা বিরুদ্ধমত প্রকাশ করছেন, তাঁরা কিন্তু সবক্ষেত্রে নিজেদের বিরুদ্ধতাকারী হিসেবে ঘোষণা করেন না। এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোন মাত্রায় তাঁরা বিরুদ্ধতা প্রকাশ করছেন, সে বিষয়ে তাঁরা নিজেরাও হয়তো পুরোপুরি সচেতন থাকেন না। বিরুদ্ধতাকে চিহ্নিত করার অন্যতম নিশ্চিত পন্থা হতে পারে সমাজে *অপর*-এর উপস্থিতিকে চিহ্নিত করা। এর ফলে চিহ্নিত করার কাজটি সহজসাধ্য হয় এবং *অপর*-এর সঙ্গে বিরুদ্ধতার যোগসূত্র টানা যায়।

কিন্তু এ বিষয়ে লেখার আগে আমি খোলসা করে বলতে চাই, যাঁরা গণতন্ত্রের বিরোধী কিন্তু তা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে নারাজ, তাঁদের সঙ্গে কেন আমি একমত